দৈনিক
জনকণ্ঠ

33

তারিখ ... 03 DEC 1996
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ৭

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা চাই

পরীক্ষার খারাপ ফলাফলের কারণে শিক্ষকদের সরকারী অনুদান বন্ধের যে নির্দেশটি সরকার দিয়েছিল এবং যে নির্দেশটি নিয়ে সমাজের বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও শিক্ষক মহলে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার বাস্তবায়ন স্থগিত হয়েছে। গত শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক এ কথাটি জানান। পরে এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয় যে, নির্দেশটি প্রত্যাহার করা হবে। সোমবারের পত্রিকায় প্রকাশিত আরেক তথ্য বিবরণীতে জানা গেল, প্রত্যাহারের কথাটি ঠিক নয়, স্থগিতই হয়েছে। তথ্য বিবরণীতে একেকদিন একেকরকম কেন হচ্ছে বোঝা মুশকিল।

নির্দেশটি যে স্থগিত বা প্রত্যাহৃত হবে এটা আগেই অনুমান করা যাচ্ছিল। প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী যা বলেছেন তা থেকে নির্দেশটির বাস্তবায়ন স্থগিতকরণের কারণটিও জানা গেছে। শিক্ষক প্রতিনিধিরা পাসের শূন্যহার রোধ করা নিয়ে আবার আলোচনায় বসার নিশ্চয়তা এবং সরকারের সৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী এ নিশ্চয়তাকে গ্রহণ করে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট পক্ষটি অর্থাৎ শিক্ষকদের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা ছাড়া হঠাৎ এরূপ একটি নির্দেশ জারি করে ফেলার হঠকারিতা ও অসমীচীনতা নিশ্চয়ই তিনি উপলব্ধি করেছেন বলে আমাদের ধারণা। নির্দেশটির যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন সে বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই।

বিগত সরকারের আমলে গৃহীত ভ্রান্তনীতি, সকল বোর্ডের অভিন্ন প্রশ্নপত্র, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদিকে এ বছরের ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে মেনে নিলেও এবং সেজন্য সরকারী নির্দেশটির তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন স্থগিত করা সমর্থনযোগ্য হলেও উক্ত কারণগুলোকে পাসের শূন্যহারের সাফাইরূপে গণ্য করা যায় না। প্রশংসার কথা এই যে, শিক্ষক প্রতিনিধিরা সেই চেষ্টা করেননি। অবশ্য করার উপায়ও ছিল না। শতকরা ৮০ শতাংশ সরকারী অনুদানে যে স্কুল-কলেজ চলে সেই স্কুল-কলেজের কোন কোনটায় কেবল প্রশ্নপত্রের ধরন পরিবর্তন আর রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন পাসের হার একেবারে শূন্য হবে, একজনও পাস করবে না এটা কোন হস্তিমূর্খকেও যুক্তিসঙ্গত বলে বোঝানো যাবে না। অথচ এবার তাই ঘটেছে। কাজেই, এ ধরনের ফলাফল বিপর্যয়ের আরও কি কি কারণ থাকতে পারে তা না খুঁজে উপায় থাকে না। খুঁজতে গেলেই প্রশ্ন ওঠে ৮০ শতাংশ সরকারী অনুদান গ্রহণকারী স্কুল, কলেজ, শিক্ষক, পরিচালক সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন কিনা, শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন না করে শিক্ষাদান নিয়ে ব্যবসাদারীতে ব্যস্ত থাকেন কিনা, ছাত্রছাত্রীরা হাজির থাকে কিনা, পড়াশোনা হয় কিনা ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে গত রবিবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে উল্লিখিত কিছু তথ্য এখানে তুলে দেয়া যায়।

এতে বলা হয়েছে, দেশের ৩৫ ভাগ বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারী নীতিমালা মানা হয়নি। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাসই হয় না। শিক্ষক আর শিক্ষার্থীরা থাকেন গরহাজির। বিগত সরকারের আমলে দেশে মোট ৩ হাজার ৩৪টি নতুন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত হয় সরকারের নীতিমালা লঙ্ঘন করে এবং রাজনৈতিক কারণে। দেশের অধিকাংশ বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি শতকরা ১৫ ভাগ, শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতি ৫০ ভাগ। একটি স্কুলে ১৮ জন শিক্ষকের মধ্যে উপস্থিত পাওয়া গেছে ২ জনকে। একটি কলেজে ১৭৬ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে উপস্থিত থাকে ২০ জন। সরকারের নীতিমালা লঙ্ঘন করে স্থাপিত এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুমোদন পাবে বা তাদের অনুমোদন বজায় থাকবে, সরকারী অনুদান পাবে, পাসের হার শোচনীয় হলেও শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনুদান ভোগ করতে থাকবেন এমন হতে পারে না। দেশের স্বার্থে এ অবস্থার পরিবর্তন সাধন অপরিহার্য। এদিক থেকে অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ছিল। এবারের জন্য নির্দেশটি স্থগিত হলেও ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের জন্য শিক্ষকদের অনুদান বন্ধের নির্দেশটি আবার চালু করা সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা খুবই সন্তোষজনক। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার এছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই।